

প্রশ্ন ১: “বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য” (Unity in Diversity) - ভারতীয় সমাজে এই ধারণা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:

“বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য” একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারণা যা ভারতের বহুত্ববাদী সমাজকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে ভাষা, ধর্ম, জাতি, গোত্র, সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য সত্ত্বেও, ভারতের মানুষ একটি জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে—এই গুণটিই “বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য”র মূলে নিহিত।

১. ধর্মীয় বৈচিত্র্য ও ঐক্য:

ভারতে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈনসহ নানা ধর্মাবলম্বী মানুষ সহাবস্থান করে। প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব আচার, উৎসব ও রীতিনীতি রয়েছে। তবুও, উৎসবগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অংশগ্রহণ ও সম্মানবোধ ভারতীয় ঐক্যের প্রতিচ্ছবি।

২. ভাষাগত বৈচিত্র্য:

ভারতে ২২টি সাংবিধানিক ভাষা ও শতাধিক উপভাষা প্রচলিত। প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব ভাষাগত পরিচয় থাকলেও হিন্দি ও ইংরেজি সরকারি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা একধরনের কার্যকর ঐক্যের মাধ্যম।

৩. জাতিগত ও সংস্কৃতিক বৈচিত্র্য:

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন উত্তর-পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠী বসবাস করে, যাদের সংস্কৃতি, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস আলাদা। তবে “ভারতীয়ত্ব”-এর ধারণা সবাইকে একটি ছাতার নিচে আনে।

৪. ঐতিহাসিক ঐক্য:

ভারতের ইতিহাসে বহুবার বহিরাগত আক্রমণ, ঔপনিবেশিক শাসন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতিগত ঐক্যের প্রমাণ মিলেছে। জাতীয় আন্দোলনের সময় সকল ধর্ম, ভাষা ও জাতির মানুষ একত্রে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়।

৫. সংবিধান ও আইনগত ঐক্য:

ভারতের সংবিধান সমগ্র জাতিকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে বেঁধে রেখেছে, যেখানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত। এই সাংবিধানিক কাঠামোই জাতীয় ঐক্য রক্ষা করে।

৬. আন্তঃসাংস্কৃতিক মেলবন্ধন:

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান যেমন সিনেমা, সংগীত, সাহিত্য, খাদ্য প্রভৃতির মাধ্যমে ঐক্যবোধ আরও দৃঢ় হয়। উদাহরণস্বরূপ, পাঞ্জাবি সংগীত বা দক্ষিণী সিনেমা আজ সর্বভারতীয় হয়ে উঠেছে।

উপসংহার:

“Unity in Diversity” শুধু একটি রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক স্লোগান নয়, এটি ভারতের সমাজ কাঠামোর অন্তর্নিহিত শক্তি। এই ধারণা ভারতের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক সহাবস্থানের ভিত্তিকে মজবুত করে। বহুবচনেই ভারতের শক্তি—এবং এই বহুবচনের মধ্যে ঐক্যই ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন ২: জাতিগত বৈচিত্র্য (Ethnic Diversity) কী? ভারতের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:

জাতিগত বৈচিত্র্য বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর বসবাস, যাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি, বর্ণ ও ইতিহাস রয়েছে। এই জাতিগোষ্ঠীগুলো সাধারণত নিজেদের আলাদা পরিচয় বজায় রেখে সহাবস্থান করে। ভারতে এই বৈচিত্র্য অত্যন্ত গভীর ও বিস্তৃত।

ভারতের জাতিগত বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য:

ভারত বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আবাসভূমি। এখানে মূলত পাঁচটি প্রধান জাতিগত গোষ্ঠী দেখা যায়:

- আর্য জাতি** – উত্তর ভারতজুড়ে বিস্তৃত, হিন্দি, পাঞ্জাবি, মারাঠি ইত্যাদি ভাষাভাষী।
- দ্রাবিড় জাতি** – দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত, তামিল, তেলুগু, মালায়ালম, কন্নড় ভাষা ব্যবহারকারী।
- মঙ্গোলয়েড জাতি** – প্রধানত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, যেমন নাগা, মিজো, মণিপুরি প্রভৃতি।
- অস্ট্রিক জাতি** – আদিবাসীদের একটি প্রাচীন শাখা, যেমন মুন্ডা, সাঁওতাল, হো, ওরাওঁ ইত্যাদি।
- নেগ্রোইড উপাদান** – দক্ষিণ ভারতের কিছু প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর প্রভাব দেখা যায়।

ভারতের জাতিগত বৈচিত্র্যের কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ:

১. উত্তর-পূর্ব ভারতের জাতিগোষ্ঠী:

এই অঞ্চলে শতাধিক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, যেমন নাগা, মিজো, ত্রিপুরী, বোরো ইত্যাদি। এরা নিজেদের ভাষা, পোশাক, ধর্ম ও ঐতিহ্য নিয়ে আলাদা পরিচিতি বহন করে।

২. আদিবাসী জনগোষ্ঠী (Scheduled Tribes):

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ৭০০-র বেশি উপজাতি রয়েছে, যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি আছে। যেমন:

- সাঁওতাল (ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ),
- গন্ড (মধ্যপ্রদেশ),
- টোডা (তামিলনাড়ু),
- ভূমিজ, মুণ্ডা, গুঁরাওঁ ইত্যাদি।

৩. ধর্মভিত্তিক জাতিগত বৈচিত্র্য:

হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, পার্সি, ইহুদি প্রভৃতি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও সাংস্কৃতিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন, কাশ্মীরি মুসলিম ও কেরালার মাঙ্গিলা মুসলমানদের সংস্কৃতি এক নয়।

৪. ভাষাভিত্তিক জাতিগত বৈচিত্র্য:

ভারতে ২২টি সাংবিধানিক ভাষা ছাড়াও প্রায় ১৬০০টিরও বেশি উপভাষা প্রচলিত। প্রত্যেক ভাষাভাষীর সঙ্গে এক ধরনের জাতিগত পরিচয় যুক্ত থাকে।

জাতিগত বৈচিত্র্যের গুরুত্ব ও প্রভাব:

- সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি:** এই বৈচিত্র্য ভারতীয় সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় ও রঙিন করেছে।
- গণতন্ত্রের ভিত্তি:** বিভিন্ন গোষ্ঠীর মত প্রকাশ ও অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।
- সংঘাত ও সমন্বয়:** যদিও মাঝে মাঝে জাতিগত সংঘাত দেখা যায় (যেমন নাগাল্যান্ড, মণিপুর, কাশ্মীর), কিন্তু ভারতীয় সংবিধান সবাইকে এক ছাতার নিচে আনার চেষ্টা করেছে।

উপসংহার:

ভারতের জাতিগত বৈচিত্র্য একটি বাস্তবতা এবং ঐতিহাসিকভাবে গঠিত এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্য ভারতকে বহুত্ববাদের এক উজ্জ্বল উদাহরণে পরিণত করেছে। এটাই ভারতের শক্তি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি।

প্রশ্ন ৩: ভারতের আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism) ও আঞ্চলিক পরিচয় (Regional Identity) ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:

ভারতের মতো একটি বৃহৎ এবং বহুবিধ সমাজে “আঞ্চলিকতাবাদ” ও “আঞ্চলিক পরিচয়” একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বাস্তবতা। এই দুটি ধারণা ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্র এবং জাতীয় সংহতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism) কী?

আঞ্চলিকতাবাদ বলতে বোঝায় কোনো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মানুষ যখন তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ বা রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষার জন্য কেন্দ্র বা অন্যান্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে একধরনের পরিচয় এবং দাবির ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। এটি অনেক সময় বিচ্ছিন্নতাবাদ, ভাষাভিত্তিক দাবি বা স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন রূপে দেখা যায়।

আঞ্চলিক পরিচয় (Regional Identity) কী?

আঞ্চলিক পরিচয় হল যখন কোনো জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নিজেদের আলাদা সত্তা হিসেবে চিনতে শুরু করে। যেমন – “তামিল”, “অসমীয়া”, “মারাঠি”, “কাশ্মীরি” – এই সব পরিচয় শুধুমাত্র ভাষার নয়, বরং আঞ্চলিক গর্ব ও ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ।

□ ভারতের প্রেক্ষিতে আঞ্চলিকতাবাদ ও আঞ্চলিক পরিচয়ের উদাহরণ:

১. ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন:

১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের মাধ্যমে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য বিভাজন হয় (যেমন – অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু)। এটি আঞ্চলিক পরিচয় স্বীকৃতি পেলেও, আঞ্চলিকতাবাদের বীজও রোপণ করে।

২. গোখাল্যান্ড আন্দোলন (পশ্চিমবঙ্গ):

দার্জিলিং অঞ্চলের নেপালি ভাষাভাষীরা একটি আলাদা রাজ্যের দাবি তোলে।

৩. অসম আন্দোলন:

বিদেশি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এবং অসমীয়া জাতীয় পরিচয়ের রক্ষার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে ওঠে।

৪. কাশ্মীর সমস্যা:

কাশ্মীরি মুসলমানদের একটি বিশেষ পরিচয় আছে যা অনেক সময় রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে গড়ায়।

৫. ভিদ্ভ, তেলেঙ্গানা ও বৃন্দেলখণ্ড:

এই অঞ্চলগুলো উন্নয়নের ঘাটতি দেখিয়ে আলাদা রাজ্যের দাবি জানিয়ে আঞ্চলিকতাবাদের উদাহরণ সৃষ্টি করে।

আঞ্চলিকতাবাদের কারণসমূহ:

১. ভাষাগত পার্থক্য
২. অর্থনৈতিক বৈষম্য
৩. সাংস্কৃতিক অহংবোধ
৪. রাজনৈতিক অবহেলা ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ
৫. স্থানীয় নেতাদের প্রভাব

ইতিবাচক দিক:

- আঞ্চলিক উন্নয়নের দাবি জোরালো হয়
- ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ হয়
- গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বাড়ে

নেতিবাচক দিক:

- জাতীয় ঐক্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে
- সহিংসতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দেয়
- আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্বের জন্ম হয় (যেমন, কাবেরী জলবন্টন নিয়ে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের বিরোধ)

উপসংহার:

ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ একটি বাস্তব এবং কখনো ইতিবাচক, কখনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তবে যদি এটি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে পরিচালিত হয়, তাহলে এটি গণতন্ত্রের শক্তি বাড়ায়। অন্যদিকে, চরমপন্থী আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয় সংহতির জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই ভারসাম্য রক্ষা করাই প্রধান চ্যালেঞ্জ।

প্রশ্ন ৪: জাতি (Caste) কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য ও প্রথাগত কার্যাবলি আলোচনা কর।

উত্তর:

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল **জাতি বা বর্ণ ব্যবস্থা**। এটি একটি সামাজিক স্তরীকরণ ব্যবস্থা যা ব্যক্তির জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয় এবং যার ভিত্তিতে সমাজে কাজ, মর্যাদা, সামাজিক সম্পর্ক ও অধিকারের বণ্টন হয়।

জাতির সংজ্ঞা:

‘জাতি’ (Caste) বলতে বোঝায় একটি বদ্ধ ও বংশানুক্রমিক সামাজিক গোষ্ঠী, যেখানে একজন ব্যক্তি জন্মসূত্রে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সাধারণত তার জীবনধারা, পেশা, বিয়ে এবং সামাজিক অবস্থান সেই জাতির মধ্যেই নির্ধারিত হয়।

G.S. Ghurye এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন: “Caste is a segmental division of society which is hereditary, endogamous, based on occupation, and has social restrictions.”

জাতির বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. বংশানুক্রমিক চরিত্র:

জাতির সদস্যপদ জন্মসূত্রে পাওয়া যায়, এটি অর্জনযোগ্য নয়।

২. বৃত্তিভিত্তিক বিভাজন:

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যগত পেশা রয়েছে (যেমন, ব্রাহ্মণ = পুরোহিত, কুস্তকার = কুমার)।

৩. বহির্বিবাহ নিষিদ্ধতা (Endogamy):

এক জাতির মানুষ সাধারণত অন্য জাতির সঙ্গে বিয়ে করে না। জাতির মধ্যে বিবাহ বাধ্যতামূলক।

৪. খাদ্য ও সামাজিক বিধিনিষেধ:

কোন জাতি কার কাছ থেকে খাবার গ্রহণ করবে, কার সঙ্গে খাবে – তার কঠোর নিয়ম রয়েছে।

৫. বৈষম্যমূলক মর্যাদা:

জাতিভেদে সামাজিক মর্যাদায় ফারাক থাকে। উচ্চ জাতির মানুষরা নিম্নজাতিকে অবহেলা করে।

৬. ধর্মীয় অনুমোদন:

জাতি ব্যবস্থা হিন্দু ধর্মের ‘বর্ণ’ ও ‘ধর্ম’ ভিত্তিক রীতি ও গ্রন্থে স্বীকৃত (যেমন, মনুস্মৃতি)।

৭. শুচিতা ও অপবিত্রতা ধারণা:

উচ্চ জাতি নিম্ন জাতিকে ‘অশুচি’ বলে মনে করত, ফলে ‘অস্পৃশ্যতা’ প্রথা চালু ছিল।

জাতির প্রথাগত কার্যাবলি:

১. শ্রমবিভাজন:

প্রত্যেক জাতি একটি নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল, ফলে সমাজে কার্যকর শ্রমবণ্টন হতো।

২. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ:

জাতি নিজস্ব নিয়মে সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করত – যেমন, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে।

৩. আত্মপরিচয় ও সামাজিক স্থান:

জাতির মাধ্যমে একজন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হতো।

৪. বহির্বিশ্ব থেকে আলাদা রাখা:

জাতির বিধিনিষেধের মাধ্যমে এক জাতি অন্য জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারত না – এটি সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখত (যদিও আজ তা বৈষম্যের কারণ বলে মনে করা হয়)।

উপসংহার:

ভারতের জাতি ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাঠামো হলেও, এটি আধুনিক সমাজে বৈষম্য, বঞ্চনা ও অসাম্যের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তবে, জাতির কিছু ঐতিহ্যগত কার্যাবলি যেমন পেশা বা সামাজিক সংগঠনের ধারণা—আজও কিছু ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সংবিধান ও আইন জাতিভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে, এবং সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতি ব্যবস্থা ক্রমশ ভাঙছে।

প্রশ্ন ৫: জাজমানি ব্যবস্থা (Jajmani System) কী? জাতি কাঠামোতে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:

জাজমানি ব্যবস্থা ভারতের গ্রামীণ সমাজের একটি ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিনিময় পদ্ধতি, যা মূলত জাতি ভিত্তিক পেশার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। এটি ছিল একধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সেবা-বিনিময়মূলক সম্পর্ক, যেখানে উচ্চ জাতির পরিবার (জাজমান) বিভিন্ন নিম্ন জাতির কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিষেবা গ্রহণ করত এবং তাদের খাদ্য বা দ্রব্য প্রদান করত।

জাজমানি ব্যবস্থার সংজ্ঞা:

ওয়াকার ফিল্ড (W.H. Wiser) জাজমানি ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করে বলেন—

"It is a system of traditional patron-client relationships based on caste in the rural society of India."

এখানে 'জাজমান' মানে সেই উচ্চ জাতির গৃহস্থ বা পরিবার, যারা নির্দিষ্ট জাতির কর্মীদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করত।

'কামিন' বা 'পরজন' মানে সেই জাতিগুলি, যারা ঐ পরিবারকে সেবা দিত (যেমন: নাপিত, কামার, কুমার, ধোপা ইত্যাদি)।

জাজমানি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:

- জাতিভিত্তিক শ্রমবণ্টন:**
প্রতিটি জাতি ছিল একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত (যেমন, কুমার মাটির বাসন বানাবে, ধোপা কাপড় ধুবে)।
- উত্তরাধিকারভিত্তিক সম্পর্ক:**
জাজমানি সম্পর্ক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলত—এক পরিবার একই কামিন পরিবারকে নিয়মিত সেবা দিত।
- অর্থের পরিবর্তে বিনিময় প্রথা:**
শ্রম বা সেবার বিনিময়ে চাল, গম, কাপড় বা অন্যান্য দ্রব্য দেওয়া হতো; নগদ অর্থ দেওয়ার প্রচলন ছিল কম।
- পারস্পরিক নির্ভরতা:**
জাজমান ও কামিন একে অপরের উপর নির্ভর করত। এ সম্পর্ক ছিল সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক।
- স্থায়ী ও বাধ্যতামূলক:**
এই সম্পর্ক থেকে সাধারণত কেউ বেরিয়ে যেতে পারত না। এটি একধরনের সামাজিক চুক্তির মতো কাজ করত।

জাতি কাঠামোতে জাজমানি ব্যবস্থার ভূমিকা:

- জাতিভিত্তিক পেশার স্থায়িত্ব:**
প্রত্যেক জাতি একটি নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং জাজমানি ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই পেশার ধারাবাহিকতা বজায় থাকত।
- সামাজিক স্তরীকরণ বজায় রাখা:**
উচ্চ ও নিম্ন জাতির মধ্যে শ্রম ও মর্যাদার ফারাক এই ব্যবস্থায় স্পষ্ট ছিল। ফলে জাতিগত শ্রেণিবিভাজন আরও মজবুত হতো।
- অস্পৃশ্যতা ও জাতিগত বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখা:**
অনেক সময় নিম্ন জাতি কামিনদের শারীরিক দূরত্ব বা নির্দিষ্ট সময়ে সেবা প্রদানের মতো নিয়ম ছিল, যা জাতিগত বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

4. গ্রামীণ সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপায়:

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিগুলি সমাজের মধ্যে তাদের অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকত।

জাজমানি ব্যবস্থার অবক্ষয়:

- নগদ অর্থনীতির প্রসার
- পেশার পরিবর্তন
- শহরায়ন ও আধুনিক শিক্ষার বিস্তার
- সংবিধান অনুযায়ী জাতিভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইন
- গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তন ও জাতিগত সচেতনতা বৃদ্ধি

উপসংহার:

জাজমানি ব্যবস্থা এক সময় ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে জাতিভিত্তিক শ্রমবণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি গঠন করেছিল। এটি যদিও পারস্পরিক নির্ভরতার নিদর্শন, তবু এর অন্তর্নিহিত জাতিভেদ ও বৈষম্য আজকের প্রেক্ষাপটে অগ্রহণযোগ্য। আধুনিক ভারতের সমাজে এই ব্যবস্থার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, তবে এর ঐতিহাসিক প্রভাব এখনও সমাজে প্রতিফলিত হয়।

প্রশ্ন ৬: সমকালীন ভারতে জাতি ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

(Analyze the nature of change in the caste system in contemporary India)

উত্তর:

ভারতীয় সমাজে জাতি ব্যবস্থা একটি বহুকাল ধরে প্রচলিত সামাজিক স্তরবিন্যাসের রূপ, তবে সমকালীন ভারত এই ব্যবস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক প্রভাবের ফলে জাতি ব্যবস্থার চরিত্র, কার্যাবলি এবং গুরুত্ব অনেকটাই রূপান্তরিত হয়েছে।

পরিবর্তনের মূল দিকগুলি:

১. আইনি ও সাংবিধানিক পরিবর্তন:

ভারতের সংবিধানে জাতিভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৭ অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ প্রভৃতির ভিত্তিতে বৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতা বেআইনি। তফসিলি জাতি

(Scheduled Castes) ও তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে তাদের শিক্ষা, চাকরি এবং রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

২. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি:

আধুনিক শিক্ষা জাতিভিত্তিক অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার ভাঙতে সাহায্য করেছে। নিম্ন জাতির মানুষের মধ্যেও আত্মমর্যাদা ও অধিকারবোধ তৈরি হয়েছে।

৩. নগরায়ন ও শিল্পায়ন:

গ্রামভিত্তিক জাতি ব্যবস্থার শক্ত ভিত্তি নগরে এসে দুর্বল হয়েছে। শহরের শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে যোগ্যতা ও দক্ষতা, জাতি নয়। এতে আন্তঃজাতিক মেলামেশা বেড়েছে।

৪. অর্থনৈতিক পরিবর্তন:

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে অনেক নিম্নজাতির মানুষ আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছে, ফলে তাদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থনীতির ভিত্তিতে সামাজিক মর্যাদা অর্জনের পথ খোলা হয়েছে।

৫. বিজ্ঞাপন ও গণমাধ্যমের ভূমিকা:

টেলিভিশন, সিনেমা ও সামাজিক মাধ্যম জাতিগত সমতার বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে জাতি-ভিত্তিক কুসংস্কার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি হয়েছে।

তবে কিছু স্থানে জাতি ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বা নতুন রূপও দেখা যায়:

- **রাজনীতিতে জাতিপ্রথার ব্যবহার:**
ভোটব্যাংক রাজনীতিতে জাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক দলগুলি অনেক সময় জাতি ভিত্তিক সংগঠনকে উল্লেখ দেয়।
- **বিয়ে ও সামাজিক সম্পর্ক:**
আন্তঃজাতি বিয়ের সংখ্যা বাড়লেও এখনও বেশিরভাগ বিয়ে জাতির মধ্যেই হয়। নিম্ন জাতিতে বিয়ে করলে এখনও অনেক স্থানে হিংসা ও সম্মানহত্যা (honour killing) ঘটে।
- **গ্রামীণ সমাজে জাতির প্রভাব:**
গ্রামীণ এলাকায় জাতিভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস এখনও জীবিত। ‘উঁচু’ ও ‘নিচু’ জাতের ধারণা এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত।

উপসংহার:

সমকালীন ভারতে জাতি ব্যবস্থার অনেক রূপান্তর ঘটেছে। তবে এটি পুরোপুরি বিলুপ্ত নয়—কখনো সরাসরি, আবার কখনো পরোক্ষভাবে এটি এখনও সমাজে প্রভাব ফেলে। তাই সামাজিক ন্যায়, শিক্ষার বিস্তার এবং মানসিকতার পরিবর্তনই জাতি প্রথার প্রকৃত পরিবর্তনের পথ।

প্রশ্ন ৭: উপজাতি (Tribe) কাকে বলে? তাদের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর:

উপজাতি (Tribe) একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী যা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে, তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং প্রথা রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উপজাতি গোষ্ঠী প্রায় ৮০টি বিভিন্ন জনগণ গঠন করেছে, এবং তারা সাধারণত আধুনিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজস্ব ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রায় অতিবাহিত করে।

উপজাতির সংজ্ঞা:

উপজাতি বলতে সেই জনগণ বা গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় যারা একত্রে জীবনযাপন করে, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের নিজস্ব ভাষা, সাংস্কৃতিক রীতি ও প্রথা অনুসরণ করে। তারা সাধারণত আদিম জীবনের অনুসরণ করে, যেখানে প্রধানত শিকার, সংগ্রহ, কৃষি ও কারুশিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা হয়।

উপজাতির বৈশিষ্ট্য:

১. স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা:

উপজাতির মানুষ সাধারণত সমাজের মূলধারার জীবনধারা থেকে আলাদা থাকে। তারা প্রথাগত জীবনধারা অনুসরণ করে, যেখানে তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত থাকে।

২. নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস:

উপজাতি গোষ্ঠীগুলি সাধারণত নির্দিষ্ট এক বা একাধিক অঞ্চলে বসবাস করে, যেগুলি পর্বত, বন, উপত্যকা বা নদী তীরবর্তী হতে পারে। তাদের আঞ্চলিক জীবনধারা তাদের জীবিকা ও সংস্কৃতির ভিত্তি।

৩. মৌলিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড:

তাদের প্রধান জীবিকা কৃষি, শিকার, মৎস শিকার, অথবা বনজ সম্পদ আহরণ। কিছু উপজাতি গোষ্ঠী বুনন, কাঠকাজ বা মাটির বাসন তৈরির মতো কারুশিল্পে নিযুক্ত থাকে।

৪. নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি:

অধিকাংশ উপজাতি গোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলে যা তাদের নিজস্ব। এছাড়া তাদের নৃত্য, গান, উৎসব ও ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয়।

৫. কম বা সীমিত সরকারি সংস্পর্শ:

প্রাথমিকভাবে, উপজাতি গোষ্ঠীগুলি সাধারণত মূলধারার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং তাদের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক চর্চাগুলি আধুনিক সমাজ থেকে অনেকটা পৃথক। তবে, বর্তমানে আধুনিক উন্নয়নের প্রভাব তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে আছড়ে পড়ছে।

৬. সামাজিক সংগঠন:

উপজাতির মধ্যে পরিবার ও গোত্রভিত্তিক সামাজিক সংগঠন দেখা যায়। এই গোত্র বা দল সাধারণত নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করে, যা প্রধানত বয়স্ক সদস্যদের বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

উপজাতির কিছু উদাহরণ:

1. **সাঁওতাল** (Santal):
সাঁওতালরা ভারতের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা অঞ্চলে বসবাস করে। তারা প্রধানত কৃষক, শিকারি এবং কাঠ কাটা কাজের সঙ্গে যুক্ত।
2. **গাঁওভি** (Gonds):
গাঁওভি উপজাতি ভারতের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলের বনাঞ্চলে বসবাস করে। তারা কৃষি, শিকার এবং কাঠ কাটা কাজের মধ্যে নিযুক্ত।
3. **ভিল** (Bhil):
ভিল গোষ্ঠী ভারতের পশ্চিমাঞ্চল বিশেষত রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে বাস করে। তারা প্রধানত কৃষক এবং শিকারী, এবং তাদের সমাজে পরম্পরাগত নৃত্য এবং সঙ্গীতের গুরুত্ব রয়েছে।
4. **ম্যাঞ্জী** (Mishing):
মিশিং উপজাতি আসামের একটি প্রধান গোষ্ঠী। তারা কৃষি ও মৎস শিকার করে এবং তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে।

উপজাতি ও আধুনিক সমাজ:

উপজাতি গোষ্ঠীগুলি যদিও আধুনিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তবে সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, আধুনিক শিক্ষা এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের জীবনে পরিবর্তন আসছে। তাদের জন্য সংরক্ষণ নীতি, বিশেষভাবে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসন এবং সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, উপজাতি সমাজের মধ্যে নারীদের ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষি প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রসারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রচেষ্টা চলছে।

উপসংহার:

উপজাতি ভারতীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা এবং জীবনযাত্রার ধরণ ভারতীয় সমাজের বৈচিত্র্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যদিও আধুনিকতা এবং উন্নয়ন তাদের জীবনধারায় প্রভাব ফেলেছে, তবুও তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে বজায় রয়েছে। বর্তমানে, তাদের সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

প্রশ্ন ৮: ভারতীয় উপজাতির বিভিন্ন প্রকার অর্থনীতি বর্ণনা কর।

উত্তর:

ভারতের উপজাতি গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিযুক্ত থাকে, যেগুলি মূলত তাদের জীবনযাত্রার উপাদান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতির অর্থনৈতিক কাঠামো একে অপরের থেকে ভিন্ন, তবে অধিকাংশই তাদের নিজস্ব পেশা, কৃষি, শিকার, সংগ্রহ, ও কারুশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। এখানে ভারতীয় উপজাতির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রধান শ্রেণী ও তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

উপজাতির প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম:

১. কৃষি (Agriculture):

অধিকাংশ উপজাতি গোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। তবে, তাদের কৃষিকাজ সাধারণত ছোট আকারের এবং ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।

- **পাল্লা বা পহেলা চাষ:**
অনেক উপজাতি গোষ্ঠী জ্বালানি ও খাদ্য উৎপাদনের জন্য খুবই প্রাথমিক ধরনের কৃষিকাজ করে, যেখানে এক ফসল চাষের পরিবর্তে কৃষি জমির ঘূর্ণন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- **শস্য চাষ:**
প্রধানত ধান, গম, মুগ ডাল, সয়াবিন, মধু ইত্যাদি শস্য উৎপাদন হয়।
- **অর্গানিক বা প্রাকৃতিক চাষ:**
অনেক উপজাতি কম্পোস্ট ও প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করে কৃষিকাজ করেন, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির তুলনায় কম রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়।

২. শিকার ও সংগ্রহ (Hunting and Gathering):

অনেক উপজাতি গোষ্ঠী বিশেষ করে পাহাড়ি এবং বনাঞ্চল অঞ্চলের বাসিন্দা, এখনও শিকার এবং বনজ দ্রব্য সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

- **শিকার:**
প্রাথমিক জীবিকার একটি অংশ হিসেবে, তারা বন্যপ্রাণী শিকার করে। এটি শুধুমাত্র খাদ্যের জন্য নয়, অনেক সময় পশুর চামড়া, দাঁত, হাড়, ইত্যাদি বিক্রি করেও আয় করা হয়।
 - **বনজ দ্রব্য সংগ্রহ:**
অনেক উপজাতি গোষ্ঠী ফল, শাকসবজি, মধু, কাঠ, গাছের ছাল, ফুল এবং অন্যান্য বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে।
-

৩. কারুশিল্প (Crafts and Handicrafts):

উপজাতির মধ্যে কারুশিল্প একটি প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম। উপজাতি গোষ্ঠীগুলি তাদের শিকার বা কৃষিকাজ থেকে অব্যাহত সময়ের মধ্যে নিজস্ব শিল্পকর্ম তৈরি করে, যেমন:

- **বুনন ও তাঁত:**
বহু উপজাতি গোষ্ঠী মাটি বা তুলো থেকে কাপড় তৈরি করে, যা তাদের নিজস্ব পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- **মৃৎশিল্প:**
মাটির বাসন, পাত্র এবং অন্যান্য ভাঙনযোগ্য সামগ্রী তৈরি করা হয়। কিছু উপজাতি গোষ্ঠী কাঠ, বাঁশ, খাঁচা, বাঁশের জিনিসপত্র তৈরি করে এবং তা বাজারে বিক্রি করে।
- **ধাতু কাজ:**
কিছু উপজাতি গোষ্ঠী ধাতু গঠন, বিশেষত তামা, সোনা, রূপা প্রভৃতি ব্যবহার করে অলঙ্কার ও অন্যান্য শিল্প তৈরি করে।

৪. বাণিজ্যিক কার্যক্রম (Trade and Commerce):

অনেক উপজাতি গোষ্ঠী স্থানীয় বা সাম্প্রতিক বাজারে তাদের তৈরি পণ্য বিক্রি করে আয় করে। তবে, এই বাণিজ্য সাধারণত খুবই সীমিত বা আদান-প্রদানমূলক।

- **অথবা সত্ত্বা বিনিময়:**
কিছু উপজাতি গোষ্ঠী নগরের সঙ্গে আদান-প্রদান করে, যেখানে তাদের বনের পণ্য বা হাতে তৈরি দ্রব্য বিক্রি করা হয় এবং এর পরিবর্তে অন্য প্রয়োজনীয় পণ্য গ্রহণ করা হয়।
- **মাঝারি ব্যবসা:**
উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু গোষ্ঠী কৃষির পাশাপাশি ছোট ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে, যেমন মিষ্টি বিক্রি, কৃষি সরঞ্জাম বা খাদ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রি করা।

৫. পশুপালন (Animal Husbandry):

পশুপালন অনেক উপজাতি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বেশ কিছু উপজাতি গোষ্ঠী গবাদি পশু পালন, দুধ উৎপাদন, মাংস সরবরাহ ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত থাকে।

- **গবাদি পশু পালন:**
গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস-মুরগি পালনে এসব উপজাতির আয় হয়, এবং তারা দুধ, মাংস ও গবাদি পশু বিক্রির মাধ্যমে আয় করে।

উপজাতি অর্থনীতির আধুনিক পরিবর্তন:

বর্তমানে, উপজাতি গোষ্ঠীর অর্থনীতি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। শহরায়ন, আধুনিক কৃষি, শিক্ষা এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রভাবের ফলে উপজাতি গোষ্ঠীও কিছু আধুনিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হয়েছে, যেমন:

- পর্যটন শিল্পে অংশগ্রহণ
- সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা
- শিল্পের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি
- নগরায়নের ফলে শহরের শ্রমবাজারে প্রবেশ

উপসংহার:

ভারতের উপজাতি গোষ্ঠীগুলি মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা ও জীবনধারার ওপর নির্ভরশীল। যদিও আধুনিক যুগে তাদের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন এসেছে, তবে তাদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সাথে যুক্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলি এখনও বজায় রয়েছে। এসব গোষ্ঠীর জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও সরকারি সহায়তা তাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ৯: PVTGs (Particularly Vulnerable Tribal Groups) কারা? তাদের বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

উত্তর:

PVTGs বা বিশেষভাবে বিপন্ন উপজাতি গোষ্ঠী (Particularly Vulnerable Tribal Groups), ভারতের এমন উপজাতি গোষ্ঠীগুলির একটি বিশেষ শ্রেণী, যারা সমাজের অন্যান্য অংশের তুলনায় আরো বেশি অবহেলিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক অবহেলার কারণে বিপদমুক্ত নয়। ভারত সরকারের সংরক্ষণ নীতিমালা এবং উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টা চলছে।

PVTGs এর সংজ্ঞা:

PVTGs হল সেই উপজাতি গোষ্ঠী যেগুলি বাকি উপজাতিদের তুলনায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝুঁকির মুখে রয়েছে, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান বিশেষভাবে নাজুক। এই গোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রা অত্যন্ত প্রাথমিক এবং তারা আধুনিক উন্নয়ন থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন।

ভারতের ট্রাইবাল আফেয়ার্স মন্ত্রক তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন এই গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করে, যাতে তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

PVTGs এর বৈশিষ্ট্য:

১. অত্যন্ত নিম্ন জনসংখ্যা:

PVTGs এর সদস্যদের সংখ্যা সাধারণত খুবই কম থাকে। এর মধ্যে অনেক গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা কয়েক হাজারেরও কম, এবং কখনো কখনো এটি শতাধিকেরও নিচে চলে যায়।

২. আধুনিকতা থেকে বিচ্ছিন্নতা:

এই গোষ্ঠীগুলি প্রাথমিক অবস্থায় বাস করে এবং আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ খুবই সীমিত থাকে। তারা এখনও প্রাথমিক কৃষি, শিকার ও সংগ্রহের মাধ্যমে জীবনযাপন করে, আর অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা বা আধুনিক প্রযুক্তির সেবা থেকে বঞ্চিত থাকে।

৩. নিঃস্ব বা অবহেলিত সামাজিক অবস্থা:

PVTGs অনেক ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে অবহেলিত ও নিঃস্ব অবস্থায় রয়েছে। তারা অনেক সময় সামাজিক অবিচার, বৈষম্য এবং খোঁচা বা নিপীড়ন সহ্য করে থাকে।

৪. স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপন্নতা:

এই গোষ্ঠীগুলি সাধারণত স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার সুবিধা থেকে বাদ পড়ে থাকে। তাদের শিশুরা শৈশবকালেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার শিকার হয়, এবং শিক্ষা থেকে তারা অনেক দূরে থাকে।

PVTGs এর কিছু উদাহরণ:

ভারতে মোট ৭৫টি PVTGs চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলির মধ্যে কিছু উদাহরণ হল:

১. আদিবাসী সাঁওতাল গোষ্ঠী (Santal):

সাঁওতালরা অনেকটাই মূলধারার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আধুনিকতার সুবিধা থেকে দুর্বল অবস্থানে রয়েছে।

২. বদিয়াল (Banjara):

এই গোষ্ঠী প্রধানত উত্তর ভারতের অঞ্চলে বসবাস করে এবং তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা অত্যন্ত বিপন্ন।

৩. ভিল গোষ্ঠী (Bhil):

ভিল গোষ্ঠী গুজরাট ও রাজস্থানের পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে, যেখানে তারা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থেকে অনেকটাই দূরে।

৪. ম্যাঙ্গি (Mising):

মিশিং গোষ্ঠী আসামের কিছু অঞ্চলে বাস করে এবং তারা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য নির্ভরশীল থাকে।

PVTGs এর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা:

১. অর্থনৈতিক সমস্যা:

PVTGs গুলি সাধারণত নির্ধারিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে থাকে এবং তাদের প্রধান জীবিকা

কৃষি, শিকার বা বনজ দ্রব্য সংগ্রহের ওপর নির্ভর করে। তারা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং আধুনিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড থেকে বাদ পড়ে।

২. স্বাস্থ্য সমস্যা:

PVTGs এর মধ্যে অনেকেই স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাদের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা, টিকাকরণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত নয়, ফলে তাদের মধ্যে অনেক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি বেশি।

৩. শিক্ষা:

এই গোষ্ঠীর অনেক সদস্যের মধ্যে সাক্ষরতার হার অত্যন্ত কম। শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্থান তাদের কাছে প্রায়ই পৌঁছায় না, যার ফলে তারা আধুনিক কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না।

৪. অবস্থান ও ভূমি অধিকারের সমস্যা:

PVTGs অনেক সময় তাদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, এবং বনের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা সরকারী নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

PVTGs এর জন্য সরকারের পদক্ষেপ:

ভারত সরকার PVTGs এর উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ:

১. বিশেষ সরকারী প্রকল্প:

PVTGs এর জন্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প তৈরি করেছে, যা তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, এবং জীবিকার সুযোগ প্রদান করে।

২. সংরক্ষণ নীতি:

PVTGs এর জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং চাকরিতে সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছে।

৩. স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ:

PVTGs এর জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা, চিকিৎসা শিবির এবং টিকাকরণ ক্যাম্প আয়োজন করা হচ্ছে।

৪. বিনামূল্যে শিক্ষা ব্যবস্থা:

PVTGs এর শিশুদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন স্কলারশিপ প্রদান করা হয়।

উপসংহার:

PVTGs হল ভারতীয় উপজাতি সমাজের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যারা সারা দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতির সুযোগ পায় না। তাদের বিশেষ অবস্থান ও দুর্বলতা উপলব্ধি করে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তবে

তাদের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন এখনও অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করতে আরও বিস্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১০: ভারতীয় গ্রামগুলির মূল বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

উত্তর:- ভারতের গ্রামগুলি সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, যেগুলি ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। ভারতীয় গ্রামগুলির জীবনযাত্রা মূলত কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, তবে আধুনিকতার প্রভাবও এখানে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে। ভারতীয় গ্রামগুলির কিছু মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাদের স্বতন্ত্র চরিত্র এবং বিশেষত্ব তুলে ধরে।

ভারতীয় গ্রামগুলির মূল বৈশিষ্ট্য:

১. কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি:

ভারতীয় গ্রামগুলির প্রধান জীবিকা সাধারণত কৃষি এবং কৃষিপণ্য উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ গ্রামে কৃষির আধিক্য দেখা যায়, যেখানে মানুষের কাজের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ফসল চাষ, পশুপালন, মৎস্য শিকার এবং বনজ সম্পদ সংগ্রহ।

• ফসল চাষ:

ধান, গম, ভুট্টা, মুগ ডাল, সবজি ইত্যাদি গ্রামীণ এলাকার প্রধান ফসল। কিছু গ্রামে কৃষিকাজে মৌসুমি ফসল চাষের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

• পশুপালন:

গবাদি পশু পালনও গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে গরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করা হয়।

২. কমিউনিটি ভিত্তিক জীবনযাত্রা:- ভারতীয় গ্রামগুলোতে সমাজের সদস্যরা একটি পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে জীবনযাপন করেন। গ্রামে সাধারণত পরিবার এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক অনেক গভীর এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেশি।

• গাঁয়ের সভা ও পরিষদ:

গ্রামে পুরনো নিয়ম ও সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলে। গ্রাম্য সভাগুলি নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়, যেমন বিবাহ, সম্পত্তি বন্টন বা সামাজিক বিচার-বিশেষণ।

• সামাজিক সংহতি:

গ্রামীণ জীবনে মানুষ একে অপরের সহায়তা করে, বিশেষত কৃষি কাজের ক্ষেত্রে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার সময়।

৩. স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জীবন: ভারতীয় গ্রামগুলি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চা এবং ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। নৃত্য, গান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলি গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

- **ধর্মীয় উৎসব:** অধিকাংশ গ্রামে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে গ্রামীণ জনগণ মেলামেশা ও সবার মধ্যে একটি অনুভূতির সৃষ্টি করতে উৎসবগুলির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়।
 - **লোকশিল্প ও কারুশিল্প:** গ্রামে হস্তশিল্পের কাজ যেমন মৃৎশিল্প, কাপড় বুনন, বাঁশ ও কাঠের কাজ ইত্যাদি অত্যন্ত জনপ্রিয়। অনেক গ্রামে লোকসঙ্গীত, নৃত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা হয়।
-

৪. প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা: গ্রামগুলির জীবনযাত্রা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। জল, মাটি, বায়ু এবং বনাঞ্চল গ্রামীণ জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **জলসম্পদ:** নদী, কূপ, ডোবা এবং অন্যান্য জলাধারগুলি গ্রামগুলির জন্য জীবনদায়ক হয়ে থাকে, কারণ গ্রামে পানি সংকট বা কৃষি কাজে পানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- **বনসম্পদ:** অনেক গ্রামে বনজ সম্পদ আহরণ, যেমন কাঠ, ফল, মধু, ঔষধি গাছ, জড়িপাতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

৫. সরকারি সুবিধার অভাব: গ্রামগুলিতে এখনও অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং যোগাযোগের সুবিধা তুলনামূলকভাবে কম। তবে, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে।

- **শিক্ষার অভাব:** গ্রামে শিক্ষার সুযোগ সীমিত, বিশেষত গ্রাম্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের জন্য। শহরের তুলনায় গ্রামীণ অঞ্চলে শিক্ষার মান কম এবং শিক্ষক সংকট রয়েছে।
 - **স্বাস্থ্যসেবা:** গ্রামে স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা ভালো নয়। এখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (PHC) সবার কাছে সহজলভ্য নয় এবং অনেক গ্রামে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সীমিত।
-

৬. উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের প্রভাব: বর্তমান সময়ে, ভারতীয় গ্রামগুলিতে আধুনিকতা ও উন্নয়ন আসছে, তবে তা সেভাবে সমগ্র গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েনি। শহরের প্রভাব, সরকারী প্রকল্প এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রামগুলিতে কিছু পরিবর্তন এনেছে।

- **বৈদ্যুতিকীকরণ:** বহু গ্রামে এখন বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছেছে, যদিও কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও বিদ্যুৎ পরিষেবা নেই।
 - **প্রযুক্তির ব্যবহার:** অনেক গ্রামে কৃষকরা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি যেমন সেচ ব্যবস্থা, সারের ব্যবহার, ফসল চাষে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।
-

উপসংহার: ভারতের গ্রামগুলি কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে একদিকে ঐতিহ্য, সামাজিকতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী, অন্যদিকে উন্নয়নমূলক অবকাঠামো এবং আধুনিক সুবিধার অভাব রয়েছে। যদিও আধুনিকীকরণের প্রভাব ইতিমধ্যেই গ্রামগুলিতে পড়তে শুরু করেছে, তবে সরকারের সহায়তা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলি গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ১১: ভারতীয় গ্রাম অর্থনীতি কী? এর প্রকৃতি বর্ণনা কর।

উত্তর: ভারতের গ্রাম অর্থনীতি দেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ভারতীয় গ্রামগুলি কৃষির উপর নির্ভরশীল, যেখানে প্রাথমিক জীবিকা কৃষি, পশুপালন, মৎস্য শিকার এবং বনজ দ্রব্য সংগ্রহের মাধ্যমে অর্জিত হয়। গ্রামাঞ্চলে শিল্প, বাণিজ্য, এবং অন্যান্য আধুনিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের তুলনায় কৃষি বেশ প্রাধান্য পায়। ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির প্রকৃতি এমনভাবে গড়ে উঠেছে, যেখানে কৃষির পাশাপাশি হাতে-কলমে কাজ, কারুশিল্প এবং সামান্য ব্যবসাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতীয় গ্রাম অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য:

১. কৃষি অর্থনীতি: ভারতের গ্রাম অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণ কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষি, বিশেষ করে মৌসুমি চাষের উপর গ্রামের অধিকাংশ মানুষের আয় নির্ভরশীল।

- **ফসল চাষ:**
ধান, গম, মুগ ডাল, তিল, সবজি, আখ ইত্যাদি শস্য চাষ করা হয়। বেশ কিছু অঞ্চলে একক বা দ্বি-ফসলী কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত।
- **পশুপালন:**
গবাদি পশু পালন যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস-মুরগি এই অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্গত। গ্রামে অনেকেই দুধ, মাংস, ও অন্যান্য পশুপণ্য বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে।
- **বীজ এবং সার ব্যবসা:**
গ্রামে কৃষকরা বীজ, সার, পোকামাকড়ের জন্য কীটনাশক ইত্যাদি কেনাবেচা করেন, যা অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অংশ।

২. আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম ও কর্মসংস্থান: ভারতের গ্রামে মানুষের কর্মসংস্থান প্রধানত কৃষি ভিত্তিক হলেও, গ্রামীণ জীবনে বিভিন্ন ছোটখাটো শিল্প এবং শ্রমিকদের কাজও গুরুত্বপূর্ণ।

- **হস্তশিল্প:** বহু গ্রামে মৃৎশিল্প, তাঁত, বুনন, কাঠের কাজ, বাঁশের কারুকাজ ইত্যাদি প্রচলিত। এসব হাতের কাজ স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়।
- **বস্ত্রশিল্প:** কিছু গ্রামে বুনন শিল্পের মাধ্যমে কাপড় তৈরি করা হয়। তুলো, সিল্ক, মখমল ইত্যাদি বস্ত্রগ্রামগুলির বিশেষ শিল্প।

- **কারিকরি কাজ:** চাষাবাদ ছাড়াও কিছু গ্রামে গ্রাম্য কাজ যেমন, নির্মাণ কাজ, সড়ক নির্মাণ, জমি পরিষ্কার ইত্যাদি হয়। এসব কাজ গ্রামের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অবদান রাখে।
-

৩. আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা: গ্রামে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রভাব দৃশ্যমান হলেও, এখনও অধিকাংশ গ্রাম ঐতিহ্যবাহী কৃষি পদ্ধতিতে নির্ভরশীল। তবে, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি যেমন সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, উন্নত বীজের ব্যবহার, আধুনিক ট্র্যাক্টর এবং কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার গ্রামীণ অর্থনীতির দিক পরিবর্তন করেছে।

- **সেচ ব্যবস্থা:** বহু গ্রামে সেচের আধুনিক পদ্ধতি যেমন রেইনফেড বা ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে চাষাবাদে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
 - **বীজ উন্নয়ন:** ভালো মানের বীজ ব্যবহার এবং আধুনিক সার ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকরা চাষের ফলন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে।
-

৪. পশুপালন এবং মৎস্য শিকার: গ্রামাঞ্চলের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম হলো পশুপালন এবং মৎস্য শিকার। গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, মৎস্য পোনা, পশু পালন ও মাছ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষ তাদের জীবন নির্বাহ করে।

- **গবাদি পশু পালন:** গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু পালনের মাধ্যমে দুধ, মাংস, ও অন্যান্য পশু পণ্য পাওয়া যায়, যা বাজারে বিক্রি করা হয়।
 - **মৎস্য শিকার:** জলাশয় বা নদীভিত্তিক মাছ চাষও গ্রামাঞ্চলে একটি প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম। কিছু গ্রামে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষও হয়।
-

৫. শিল্প ও বাণিজ্য: গ্রামগুলিতে ছোটখাটো শিল্প এবং বাণিজ্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব শিল্প সাধারণত স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রি করে এবং একে অপরের মধ্যে পণ্য বিনিময়ও ঘটে।

- **স্থানীয় বাজার:** গ্রামগুলিতে সাধারণত ছোট বাজার থাকে, যেখানে স্থানীয় কৃষক এবং শিল্পীরা তাদের পণ্য বিক্রি করে। এই বাজারে খাদ্যপণ্য, কাঁচামাল, এবং হাতে তৈরি পণ্য বিক্রি করা হয়।
- **সামাজিক ও শস্য বাণিজ্য:** স্থানীয় শস্যের কেনাবেচার মাধ্যমেও গ্রামীণ অর্থনীতি ঘুরে থাকে। যেমন ধান, আখ, গম ইত্যাদি চাষ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়।

৬. সামাজিক অবকাঠামো ও সরকারী সহায়তা: ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির উপর সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রভাব পড়েছে। কৃষক এবং গ্রামীণ জনগণের জন্য সরকারি সহায়তা যেমন ঋণ, প্রণোদনা, কৃষি সহায়তা এবং বিকল্প জীবিকা উত্সাহিত করার জন্য নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে।

- **কৃষি ঋণ এবং সহায়তা:** সরকার কৃষকদের জন্য কৃষি ঋণ প্রদান করে থাকে, যা তারা কৃষি কার্যক্রমে বিনিয়োগ করতে পারে।
- **বেসিক অবকাঠামো:** গ্রামে সড়ক নির্মাণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলি গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

উপসংহার: ভারতের গ্রাম অর্থনীতি একটি বহুমুখী কাঠামো, যেখানে কৃষি, পশুপালন, শিল্প, এবং স্থানীয় বাণিজ্য প্রধান ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ জীবনের প্রাকৃতিক সম্পদ, সংস্কৃতি, এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে এই অর্থনীতি সম্পর্কিত। যদিও আধুনিকতার প্রভাব ধীরে ধীরে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছে, তবে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সহায়তা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সাহায্যে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হচ্ছে। তবে, এই অর্থনীতি আরো শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি, সরকারি সহায়তা এবং আরও উন্নত কৃষি অবকাঠামো।

প্রশ্ন ১২: পরিবার কী? এর প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

উত্তর: পরিবার সামাজিক কাঠামোর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উপাদান, যা সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি ব্যক্তির শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবার শব্দটির সাধারণ সংজ্ঞা হলো এমন একটি সংহত সামাজিক একক, যেখানে মানুষ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে এবং একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। পরিবার সাধারণত ব্যক্তির জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং মানসিক বিকাশের প্রাথমিক পরিবেশ হিসেবে কাজ করে।

পরিবারের সংজ্ঞা: পরিবার হল সেই সামাজিক ইউনিট যেখানে একাধিক সদস্য একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একত্রে বাস করে। এই সদস্যরা সাধারণত একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করে, যেমন পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে, ভাই-বোনের মধ্যে সম্পর্ক। এটি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে কাজ করে, যা একদিকে পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা ও ভালোবাসা প্রদান করে, অন্যদিকে তাদের ভবিষ্যৎকে সংজ্ঞায়িত করে।

পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য:

১. সম্পর্কের ভিত্তি: পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এখানে, পিতা-মাতা, সন্তানের, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে সম্পর্কের গুণগত ভিত্তি থাকে। এটি প্রেম, সহানুভূতি, দায়িত্বশীলতা এবং পারস্পরিক সম্মান দ্বারা গঠিত।

- **দায়িত্ব ও কর্তব্য:** পরিবারের প্রতিটি সদস্য একে অপরের প্রতি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে। পিতা-মাতা সন্তানের যত্ন নেয়, সন্তান তাদের বৃদ্ধ বয়সে সহায়তা করে এবং ভাই-বোনদের মধ্যে সহায়তা ও সহযোগিতার সম্পর্ক থাকে।

২. সমাজিকীকরণ: পরিবার হলো প্রথম স্থান, যেখানে একজন ব্যক্তি সামাজিক আচরণ শেখে এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সহায়তা ও শিক্ষা প্রদান করে।

- **শিক্ষা:** পরিবার শিশুকে প্রথম সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে। এটি সাংস্কৃতিক, নৈতিক, এবং শিষ্টাচারের পাঠ।

৩. আর্থিক সহায়তা ও নিরাপত্তা: পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আর্থিক সহায়তা। পরিবার সাধারণত অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করে, বিশেষত পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য।

- **অর্থনৈতিক দায়িত্ব:** পিতা-মাতা সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে। এতে পরিবার সদস্যদের একে অপরকে সমর্থন করার একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে।

৪. ভালোবাসা ও সহানুভূতি: পরিবার হলো মানুষের জীবনের সেই স্থানে যেখানে তারা নির্ভয়ে ভালোবাসা ও সহানুভূতির অনুভূতি অনুভব করে। এটি একজন ব্যক্তির মানসিক শান্তি ও আবেগের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

- **মানসিক ও আবেগিক সমর্থন:** পরিবার মানসিক স্বাস্থ্য এবং আবেগের দিক থেকে একে অপরকে সমর্থন করে। এটা সুখ-দুঃখ, উল্লাস-দুঃখ এবং সফলতা-ব্যর্থতার সময়েও একে অপরের পাশে থাকে।

৫. সামাজিক সুরক্ষা: পরিবার একজন সদস্যকে সামাজিকভাবে সুরক্ষা দেয় এবং তাকে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য শক্তি প্রদান করে। এটি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল, যেখানে একজন সদস্য তার অনুভূতি, ইচ্ছা, এবং চিন্তা বিনা ভয়ে প্রকাশ করতে পারে।

- **সামাজিক সহায়তা:** পরিবার হলো এমন একটি জায়গা যেখানে সদস্যরা একে অপরের জন্য সহায়ক হয়ে থাকে, সমাজে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় বা বিপদে পড়লে তারা একে অপরকে সহায়তা প্রদান করে।

৬. জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকা: পরিবারের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার জীবনের বিভিন্ন স্তরে সহায়তা পেয়ে থাকে। শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে, স্কুল জীবন, প্রাপ্তবয়স্কতা, বিবাহ এবং বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **বৃদ্ধদের সেবা:** পরিবারের বৃদ্ধ সদস্যরা অধিকাংশ সময় সন্তানের কাছে সেবা লাভ করেন এবং পরিবার তাদের আবেগিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

পরিবারের ধরণ: পরিবারের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে, যা তার সদস্যদের কাঠামো ও তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ এবং পরিচিত ধরণগুলো হলো:

১একক পরিবার:

এটি একটি ছোট পরিবার যেখানে সাধারণত একজন পিতা, একজন মাতা এবং তাদের সন্তানরা বসবাস করে। এটি আধুনিক সমাজের একটি সাধারণ কাঠামো।

২. **বিস্তৃত পরিবার:** এটি একটি বড় পরিবার, যেখানে পিতা-মাতা, সন্তান, দাদা-দাদি, নানা-নানী, চাচা-চাচি, মামা-মামীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা একসঙ্গে বাস করে।

৩. **একক পিতা-মাতা পরিবার:** এটি একটি বিশেষ ধরনের পরিবার যেখানে শুধুমাত্র এক জন পিতা বা মাতা সন্তানদের সাথে বাস করে, তাদের অন্য পিতা বা মাতা তাদের সাথে থাকে না।

উপসংহার: পরিবার হল সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, যা প্রতিটি সদস্যকে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক দিক থেকে সহায়তা প্রদান করে। এটি মানুষের জীবনযাত্রার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, যেখানে শৈশবকালীন শিক্ষা, সামাজিকীকরণ, আর্থিক সহায়তা এবং আবেগিক সুরক্ষা প্রদান করা হয়। পরিবার সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান, যা প্রতিটি সদস্যকে সমাজের একজন সুষ্ঠু নাগরিক হতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ১৩: পরিবার কত প্রকার এবং উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পরিবার হলো একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তি একত্রে বাস করে এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল থাকে। এটি সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা সমাজের প্রতিটি সদস্যকে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক দিক থেকে সহায়তা প্রদান করে। পরিবার বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হতে পারে, এবং প্রতিটি ধরনের পরিবার তার কাঠামো, সামাজিক দায়িত্ব এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে আলাদা।

পরিবারের প্রকার: পরিবারের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ধরণগুলো হলো:

১. **পারমাণবিক পরিবার (Nuclear Family):** পারমাণবিক পরিবার হলো ছোট ধরনের পরিবার, যেখানে একজন পিতা, একজন মাতা এবং তাদের সন্তানরা একসঙ্গে বসবাস করে। এটি আধুনিক সমাজে সবচেয়ে প্রচলিত পরিবারের ধরণ।

- **উদাহরণ:** পিতা, মাতা এবং তাদের দুটি সন্তানরা একটি অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করছে।
- **বিশেষ বৈশিষ্ট্য:** পারমাণবিক পরিবারে সদস্য সংখ্যা সীমিত এবং পরিবারটি একটি অল্প সংখ্যক সদস্যের মধ্যে নিজস্ব পরিবেশ তৈরি করে। এই ধরনের পরিবারে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সম্পর্কের উপরই প্রধান মনোযোগ দেওয়া হয়।

২. **বিস্তৃত পরিবার (Extended Family):** বিস্তৃত পরিবারে একাধিক প্রজন্মের সদস্যরা একসঙ্গে বাস করে। এতে পিতা, মাতা, সন্তান, দাদা-দাদি, নানা-নানী, চাচা-চাচি, মামা-মামী ইত্যাদি সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো যেখানে পরিবারের সকল সদস্য একে অপরের সহায়ক এবং একটি নির্দিষ্ট সামাজিক রীতি অনুযায়ী একত্রিত থাকে।

- **উদাহরণ:**পিতা-মাতা, তাদের সন্তান, দাদা-দাদি, নানা-নানী এবং চাচা-চাচি একসঙ্গে একটি বড় বাড়িতে বসবাস করছে।
- **বিশেষ বৈশিষ্ট্য:**বিস্তৃত পরিবারে বেশিরভাগ সময় পারিবারিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং রীতিনীতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটি একটি সামাজিক সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে, যেখানে পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে সহায়তা এবং যত্ন প্রদান করে।

৩. একক পিতা-মাতা পরিবার (Single-Parent Family):একক পিতা-মাতা পরিবার হলো সেই ধরনের পরিবার, যেখানে শুধুমাত্র একজন পিতা বা মাতা তার সন্তানদের সঙ্গে একত্রে বাস করে। এই ধরনের পরিবারে সাধারণত এক পিতা বা মাতা সন্তানের দায়িত্ব পালন করে, যেটি একটি বিশেষ ধরনের পারিবারিক কাঠামো।

- **উদাহরণ:**একজন মহিলা তার সন্তানদের সঙ্গে এককভাবে বসবাস করছেন, কারণ তার স্বামী তাদের ছেড়ে চলে গেছে বা অন্য কোনো কারণে তারা একত্রে বসবাস করছে না।
- **বিশেষ বৈশিষ্ট্য:**এই ধরনের পরিবারে সাধারণত পিতা বা মাতা একাই আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। এটি কিছু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে, যেমন একক পিতার মানসিক চাপ, আর্থিক সমস্যা ইত্যাদি।

৪. সংসারী পরিবার (Joint Family):সংসারী পরিবার, বা যৌথ পরিবার, একটি বিশাল পরিবার কাঠামো, যেখানে একাধিক প্রজন্মের সদস্যরা একত্রে বসবাস করে। পরিবারটির সদস্যরা সকলের প্রতি আন্তরিক দায়িত্ব পালন করে এবং একে অপরকে সহায়তা প্রদান করে।

- **উদাহরণ:**একটি পরিবারে পিতা-মাতা, তাদের সন্তানের সাথে দাদা-দাদি, চাচা-চাচি এবং অন্যান্য আত্মীয়রা একত্রে বাস করছে।
- **বিশেষ বৈশিষ্ট্য:**যৌথ পরিবারে সদস্যরা নিজেদের আয়, সম্পত্তি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা ভাগ করে নেয়। এটি একটি শক্তিশালী সামাজিক একক হিসেবে কাজ করে, যেখানে পরিবারে সম্পর্কের দিক দিয়ে আন্তরিকতা এবং সহযোগিতা থাকে।

৫. মৌলিক পরিবার (Blended Family):মৌলিক পরিবার হলো সেই পরিবার, যেখানে একজন বা উভয় পিতা-মাতা পূর্ববর্তী বিবাহের সন্তানদের সাথে নতুন পরিবার গঠন করে। এই ধরনের পরিবারে পূর্ববর্তী বা নতুন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক এবং সমন্বয় গড়ে ওঠে।

- **উদাহরণ:**একজন পুরুষ বা মহিলা দ্বিতীয় বিয়ের মাধ্যমে তাদের নতুন স্ত্রীর বা স্বামীর সন্তানদের সাথে একত্রে বসবাস করছেন।
- **বিশেষ বৈশিষ্ট্য:**এই ধরনের পরিবারে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সম্পর্কের জটিলতা হতে পারে, কারণ তাদের জন্য নতুন পরিবারে শৃঙ্খলা ও পরিচিতির সমস্যা তৈরি হতে পারে।

৬. লিভ-ইন পরিবার (Live-In Family):লিভ-ইন পরিবার হলো এমন একটি পরিবার, যেখানে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে বসবাস করেন, কিন্তু তারা আইনি বা ধর্মীয় বিবাহের মধ্যে নেই। এই ধরনের সম্পর্ক সাধারণত আইনগত বা সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে স্বীকৃত নয়, তবে তারা একে অপরের সঙ্গে পরিবার গঠন করে।

- **উদাহরণ:**

একটি পুরুষ এবং মহিলা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন এবং তাদের সন্তান রয়েছে, কিন্তু তারা আইনি বিবাহিত নন।

- **বিশেষ বৈশিষ্ট্য:**

এই ধরনের সম্পর্ক সমাজে কিছু বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে, কারণ এটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারের কাঠামো থেকে বেরিয়ে যায়। তবে, এটি বর্তমানে কিছু সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

উপসংহার:

পরিবার সমাজের একটি অপরিহার্য অংশ এবং এর বিভিন্ন ধরণ সমাজের সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। প্রতিটি পরিবারের ধরণ তার সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক, দায়িত্ব এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভিন্ন হয়। পরিবারটি যত বড় বা ছোট হোক, এর মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যাতে তারা একটি সুস্থ, সমৃদ্ধ এবং সুখী জীবন যাপন করতে পারে।